

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের ব্যাখ্যায়

হাদিসে আব্বাঠন

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারায় নববি রহ. (৬৭৬ হি.)

ব্যাখ্যা :

ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারায় নববি রহ. (৬৭৬ হি.)

ইমাম তাকিউদ্দিন ইবনু দাকিক আল-ইদ রহ. (৭০২ হি.)

শাইখ ড. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রহ. (১৪২১ হি.)

অনুবাদ:

মাওলানা আবু নুয়াইম শরীফ ও মুফতি তারেকুজ্জামান

সম্পাদনা:

মুফতি তারেকুজ্জামান

আল-ইদ
মাকতাবাতুল আযলাফ

ভেতরের পাতায়

সম্পাদকের কথা.....	৮
১ নং হাদিস.....	১৫
▶ সমস্ত কাজ নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত	
২ নং হাদিস.....	৬২
▶ হাদীসে জিবরীল, (বিষয়) দ্বীনদারি ও ইবাদাতের বিভিন্ন স্তর	
৩ নং হাদিস.....	১৮৮
▶ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর; শাহাদাত, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম	
৪ নং হাদিস.....	১৯৮
▶ ফেরেশতাকে চারটি কালিমা (বিষয়) লিপিবদ্ধ করার আদেশ করা হয়— রিজিক, মৃত্যুক্ষণ, আমল এবং সৌভাগ্যবান নাকি হতভাগা।	
৫ নং হাদিস.....	২২৭
▶ যে আমাদের (ধর্মীয়) কাজে নতুন কিছু সংযোজন করে, তা পরিত্যাজ্য	
৬ নং হাদিস.....	২৪৩
▶ হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট। আর এ দুভয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয়, মানুষের কলব নষ্ট হলে সব নষ্ট হয়ে যায়	
৭ নং হাদিস.....	২৭০
▶ কল্যাণকামিতাই দ্বীন	

৮ নং হাদিস..... ২৮৯

- ▶ ||| মানুষের শাহাদাতের স্বীকৃতির আগ পর্যন্ত আমি যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট

৯ নং হাদিস..... ৩০৯

- ▶ ||| তোমাদেরকে আমি যা নিষেধ করেছি তা করো না, আর যা আদেশ করেছি তা যথাসম্ভব পালন করো

১০ নং হাদিস..... ৩২৮

- ▶ ||| যার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় হারাম এবং আহর্য্যও হারাম তার দুআ কী করে কবুল হবে?

১১ নং হাদিস..... ৩৫১

- ▶ ||| যা সন্দেহমূলক তা ছেড়ে যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ করো

১২ নং হাদিস..... ৩৫৮

- ▶ ||| মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্য হলো, অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা

১৩ নং হাদিস..... ৩৬৫

- ▶ ||| মুমিন নয়, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য নিজের পছন্দের জিনিস ভালবাসে

১৪ নং হাদিস..... ৩৭৬

- ▶ ||| তিনটি অপরাধ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্ত বৈধ নয়

১৫ নং হাদিস..... ৩৯৭

- ▶ ||| যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে, মেহমানের সমাদর করে

১৬ নং হাদিস..... ৪১০

- ▶ ||| তুমি রাগ করো না

১৭ নং হাদিস..... ৪১৮

- ▶ ||| আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান (সদয় আচরণ) করা আবশ্যক করেছেন

১৮ নং হাদিস..... ৪৩৩

- ▶ ||| মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তা মন্দ কাজ মুছে ফেলবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো

১৯ নং হাদিস ৪৪৬

- ▶ ||| (মানুষের ভাগ্য লেখার) কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে

২০ নং হাদিস..... ৪৬৭

- ▶ ||| যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করো

৬ নং হাদিস

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

‘আবু আব্দুল্লাহ নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণি, তিনি বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুটোর মাঝে আছে কতক সংশয়পূর্ণ বিষয়, যা সম্পর্কে অনেক মানুষ অজ্ঞাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকল সে তাঁর দীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখল। আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়ল সে হারামে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো। যেমন, কোনো রাখাল যখন (বাদশাহর) সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে তার পশুপাল চরায় তখন সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। জেনে রেখো, প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। জেনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। জেনে রেখো, দেহের মধ্যে আছে একটি মাংসপিণ্ড। যখন তা ঠিক থাকে তখন সারা দেহ ঠিক থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটা হচ্ছে কলব (অন্তর)।’^[১]

[১] সহিহুল বুখারি : ৫২, ২০৫১; সহিহ মুসলিম : ১৫৯৯

৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যা

শাইখ ইবনু উসাইমিন রহ. বলেন :

হাদিসের বক্তব্য :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

‘নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।’

উক্ত হাদিসে শরিয়ার বিধিবিধানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. হালাল, যা সুস্পষ্ট এবং বিষয়টি সবাই জানে। যেমন— ফল, শস্য, বৈধ পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। দুই. হারাম, যা সুস্পষ্ট এবং বিষয়টি সবাই জানে। যেমন— ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি। তিন. সংশয়পূর্ণ বিষয়; তা হালাল নাকি হারাম স্পষ্টভাবে জানা যায় না। এগুলো সংশয়পূর্ণ হওয়ার কারণ, হয়তো দলিলের মধ্যে সংশয় থাকে অথবা সন্দেহ থাকে মাসআলার সাথে দলিলের সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে। তাই কখনো বিধানের ক্ষেত্রে সংশয় হয় আবার কখনো সংশয় হয় বিধানের কেন্দ্রবিন্দুতে।

দলিলের মধ্যে সংশয় এভাবে সৃষ্টি হয়—প্রথমত, হাদিসটি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত কি না? দ্বিতীয়ত, হাদিস দ্বারা উক্ত বিধান প্রমাণ হচ্ছে কি না?

এমনটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। হাদিসের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বেশি ঘটে যে, এটি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কি না এবং এ হাদিস দ্বারা অমুক বিধান সাব্যস্ত হচ্ছে কি না?

আর বিধানের কেন্দ্রবিন্দুতে সংশয় সৃষ্টি হয় এভাবে—হাদিসটি এ নির্দিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না? উসুলবিদরা (ফিকহের মূলনীতি প্রণেতাগণ) প্রথমটিকে বলেন ‘তাখরিজুল মানাত’ (হুকুমের ইল্লাত বা কারণ নির্ণয়করণ), আর দ্বিতীয়টিকে বলেন, ‘তাহকিকুল মানাত’ (হুকুমের ইল্লাত বা কারণ অন্যত্রে

বাস্তবায়ন)।^[১]

হাদিসের বক্তব্য :

لَا يَغْلُمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

[১] এখানে উসুলে ইজতিহাদের দুটি পরিভাষা বলা হয়েছে। যথা, ‘তাখরিজুল মানাত’ বা হুকুমের ইঙ্গিত নির্ণয়করণ ও ‘তাহকিকুল মানাত’ বা হুকুমের ইঙ্গিত অন্যত্রে বাস্তবায়ন। আমরা এখানে আরেকটি যুক্ত করছি, আর সেটি হলো ‘তানকিহুল মানাত’ বা হুকুমের ইঙ্গিত যাচাই ও পরিমার্জন। উসুলবিদদের নিকট এ তিনটি পরিভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ। আমরা খুব সংক্ষেপে পরিভাষা তিনটির পরিচয় তুলে ধরছি। সুতরাং ‘তাখরিজুল মানাত’ হলো, ইজতিহাদের মাধ্যমে শরিয়তের কোনো একটি বিধান থেকে তার ইঙ্গিত বা কারণ বের করা, যা কুরআন-হাদিসের কোথাও উল্লেখ নেই। যেমন, হাদিসে স্বর্ণ, রূপা, গম, যব, খেজুর, লবণ—এ ছয়টি পণ্যকে সুদি পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এগুলো পরস্পরে সমান সমান করে এবং নগদে লেনদেন করতে হবে। কমবেশি করে বা বাকিতে লেনদেন করলে সুদ হবে। [সহিহ মুসলিম : ১৫৮৭] এ হাদিসে মোট ছয়টি জিনিসের নাম উল্লেখ করা হলেও ফুকাহায়ে কিরাম ইজতিহাদ করে এখান থেকে দুটি বিষয়কে সুদি পণ্য হওয়ার ইঙ্গিত নির্ণয় করেছেন। যথা, একজাতীয় জিনিস হওয়া এবং পরিমাপযোগ্য জিনিস হওয়া। সুতরাং যেখানেই পরিমাপযোগ্য একজাতীয় দুটি পণ্যের পারস্পরিক লেনদেন হবে, সেখানেই পণ্য দুটির পরিমাপ সমান সমান হতে হবে এবং নগদে হতে হবে। নয়তো তা সুদি লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং উক্ত হাদিস থেকে ‘একজাতীয় জিনিস হওয়া এবং পরিমাপযোগ্য জিনিস হওয়া’ এ দুটি ইঙ্গিত বের করাটাকে ‘তাখরিজুল মানাত’ বলা হবে। আর ‘তাহকিকুল মানাত’ হলো, কোনো একটি বিধানের সর্বস্বীকৃত ইঙ্গিত অন্যত্র প্রয়োগ করা। যেমন, বিভালের মুখের লালা নাপাক নয়। হাদিসে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এ বলে যে, ‘বিভাল তোমাদের আশপাশে সর্বদা ঘুরাফেরাকারী প্রাণী।’ [সুনানু আবি দাউদ : ৭৫] এ থেকে বুঝা গেল, মানুষের আশপাশে সর্বদা ঘুরাফেরা করা এমন একটি ইঙ্গিত, যার কারণে প্রাণীর মুখের লালা নাপাক বলে গণ্য হবে না। সরাসরি নসে থাকায় এ ইঙ্গিতটি সর্বস্বীকৃত। অতঃপর এ ইঙ্গিতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরাম ঘরের ইঁদুরের লালাকে নাপাক গণ্য করেননি। কেননা, ইঁদুরও মানুষের আশপাশে সর্বদা ঘুরাফেরা করে। তাহলে সর্বস্বীকৃত একটি ইঙ্গিতকে (যথা মানুষের আশপাশে সর্বদা ঘুরাফেরা করাকে) অন্যত্র (যথা, ইঁদুরের ক্ষেত্রে) প্রয়োগ করাটাই হচ্ছে ‘তাহকিকুল মানাত’। আর ‘তানকিহুল মানাত’ হলো, কোনো একটি ঘটনা বা আলোচনা থেকে গৌণ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে বিধানের মূল ইঙ্গিতটি বের করে আনা। যেমন, অধিক সহবাসে অভ্যস্ত একজন সাহাবি রমজান মাসে সাওমরত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাফফারা আদায় করতে বললেন। [সহিহুল বুখারি : ৫৩৬৮] এখানে কাফফারা আবশ্যিক হওয়ার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন, তিনি একজন সাহাবি হওয়া, আরব দেশের অধিবাসী হওয়া, অধিক সহবাসে অভ্যস্ত হওয়া, সহবাস করা, সহবাসটা স্ত্রীর সাথে হওয়া, রমজান মাসে হওয়া, সাওমরত অবস্থায় থাকা ইত্যাদি। এতগুলো বিষয় থেকে একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে বলেন যে, এখানে কাফফারা আবশ্যিক হওয়ার মূল ইঙ্গিত হলো, রমজান মাসে সাওমরত অবস্থায় সহবাস করা। সুতরাং রমজান মাসে কেউ সাওমরত অবস্থায় সহবাস করলেই তার ওপর কাফফারা আবশ্যিক হবে; চাই সে সাহাবি হোক বা অন্য কেউ, আরববাসী হোক বা অনারব, অধিক সহবাসে অভ্যস্ত হোক বা কম সহবাসে অভ্যস্ত, স্ত্রীর সাথে হোক বা অন্য কারও সাথে। সুতরাং এই যে অনেকগুলো বিষয় থেকে মূল ইঙ্গিত বের করে আনা, এটাই হলো ‘তানকিহুল মানাত’। [আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আমিদি : ৩/৩০২-৩০৩; শারহুত তালবিহ আলাত-তাওজিহ, তাফতাজানি : ২/১৫৪-১৫৫; রাওজাতুন নাজির, ইবনু কুদামা : ২/১৪৫-১৫০; কাওয়ামিদুল ফিকহ, মুজাদ্দিদি : পৃ. নং ২২১, ২২৩, ২৩৯]—সম্পাদক।

‘যা সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত।’

অর্থাৎ সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক মানুষ জানে না, আবার অনেকেই জানে। সুতরাং অবহিতদের সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনই অনবহিতদের সংখ্যাও অনেক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। যদি তিনি তা বলতেন তাহলে অবহিতদের সংখ্যা হতো অনেক কম।

অনেক মানুষের তা না জানার থাকার কারণ, হয়তো ইলম স্বল্পতা বা বুঝের কমতি কিংবা জানার চেষ্টা-প্রচেষ্টার অভাব।

হাদিসের বক্তব্য :

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

‘যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকল।’

অর্থাৎ এগুলো থেকে দূরে থাকল।

হাদিসের বক্তব্য :

فَقَدْ اسْتَبْرَأَ

‘সে পবিত্র রাখল।’

অর্থাৎ (আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে) দায়মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথ গ্রহণ করল।

হাদিসের বক্তব্য :

لِدِينِهِ

‘তার ধীনকে।’

অর্থাৎ তার ও আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে সে তার ধীনকে পবিত্র রাখল।

হাদিসের বক্তব্য :

وَعَرَضَهُ

‘এবং তার সম্ভ্রমকে।’

অর্থাৎ তার ও মানুষের মধ্যকার ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে সে তার সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখল। কারণ, কেউ সন্দেহজনক বিষয় করতে থাকলে মানুষ তাকে নিয়ে নানারকম কথাবার্তা বলতে থাকবে যে, অমুক এই করেছে, সেই করেছে ইত্যাদি।

হাদিসের বক্তব্য :

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

‘আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়ল সে হারামে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো।’

এর শাব্দিক অর্থ, আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়ল সে হারামে লিপ্ত হলো। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. সংশয়পূর্ণ বিষয়ে জড়িত হওয়া হারাম। দুই. এতে জড়িত হলে তা হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ বা মাধ্যম হয়। এখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ দুটি অর্থের মধ্যে কোনটি অধিক বিশুদ্ধতর।

হাদিসের বক্তব্য :

كَالرَّاعِي

‘যেমন কোনো রাখাল’

অর্থাৎ উট, গরু বা ছাগলের রাখাল।

হাদিসের বক্তব্য :

يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى

‘যখন (বাদশাহর) সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে তার পশুপাল চরায়’

অর্থাৎ সংরক্ষিত কোনো এলাকায়। কারণ, কখনো (বাদশাহ বা কর্তৃত্বশীল কারও জন্য) নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। তখন সেখানে ন্যায্য বা অন্যথ্য কোনোভাবেই পশু চরানো যায় না।

হাদিসের বক্তব্য :

يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

‘তখন সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে।’

অর্থাৎ এমন জায়গায় কেউ পশু চড়ালে সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কারণ, চতুষ্পদ জন্তু যখন দেখবে ওই সংরক্ষিত এলাকা সবুজ ঘাসে পূর্ণ তখন সে তাতে ঢুকে যেতে চাইবে। তা থেকে তাকে নিবৃত্ত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলোর একই অবস্থা। বান্দা যখন সেগুলোর পাশে যাবে তখন তার প্রবৃত্তিকে আটকে রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায়, ‘আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হলো।’ এর অর্থ— হারামে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো। কারণ, উদাহরণের মাধ্যমে অর্থ স্পষ্ট হয়।

হাদিসের বক্তব্য :

وَأَنَّ

‘জেনে রেখো।’

এটা কথা শুরু করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ। উদ্দেশ্য, সামনের বক্তব্য সম্পর্কে শ্রোতাকে সতর্ক করা।

হাদিসের বক্তব্য :

وَأَنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى

‘প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে।’

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তিনি বাদশাহর সংরক্ষিত এলাকার ছকুম বর্ণনা করছেন যে, তা হালাল নাকি হারাম। কারণ, বাদশাহদের কিছু সংরক্ষিত এলাকা হালাল হয়, আবার কিছু হয় হারাম। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য হলো শুধু একটি সংরক্ষিত এলাকার বর্ণনা দেওয়া।

সংরক্ষিত চারণভূমির দুধরনের। এক. শাসক নিজের জন্য ও নিজের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য সংরক্ষিত চারণভূমি। এ ধরনের চারণভূমি বানানো হারাম। দুই. মুসলিমদের পশু তথা, সদকার পশু, জিহাদের পশু ইত্যাদির জন্য সংরক্ষিত চারণভূমি। এ ধরনের চারণভূমি বানানো হালাল। কারণ শাসক তা নিজের জন্য করেনি। রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ

‘তিনটি জিনিসের মধ্যে সমস্ত মুসলিম সমানভাবে অংশীদার—ঘাস, পানি ও আগুন।’^[১]

হাদিসের বক্তব্য :

أَلَا وَإِنَّ جَمِیَّ اللَّهِ مُحَارِمُهُ

‘জেনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।’

বাক্যটিকে তাকিদ (জোরদান) করা হয়েছে إِنَّ ও أَلَا শব্দ দুটির মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ বিধানগুলো। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হওয়া না। কারণ, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিধানগুলো শাসকের সংরক্ষিত এলাকার মতো, সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

হাদিসের বক্তব্য :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً

‘জেনে রেখো, দেহের মধ্যে আছে একটি মাংসপিণ্ড।’

এ বাক্যটিকেও তাকিদ (জোরদান) করা হয়েছে إِنَّ ও أَلَا শব্দ দুটির মাধ্যমে। অর্থাৎ মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড আছে। مُضْغَةً বলা হয়, মানুষ খাওয়ার সময় একবারে যা চিবাতে পারে সেটির পরিমাণ, যা আকৃতিতে বেশ ছোট।

হাদিসের বক্তব্য :

إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

‘যখন তা ঠিক থাকে তখন সারা দেহ ঠিক থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটা হচ্ছে কলব (অন্তর)।’

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৭৭ - হাদিসটির সনদ সহিহ।

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্তকে তার জবাবের ওপর নির্ভরশীল করেছেন এভাবে—অন্তর যদি ঠিক থাকে তাহলেই শরীর ঠিক থাকবে, আর অন্তর যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পূর্ণ শরীরটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছু উলামায়ে কিরাম এক্ষেত্রে উপমাটি দেন শাসকের মাধ্যমে। তারা বলেন, শাসক যদি ভালো হন তাহলে প্রজারা ভালো হবে। আর তিনি যদি ভালো না হন তাহলে প্রজারাও ভালো হবে না। কিন্তু বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলেন, এ উপমাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ, অনেক সময় শাসক আদেশ দেন, কিন্তু প্রজারা তা মানে না। পক্ষান্তরে অন্তর যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আদেশ দেয় তাহলে সেগুলো অবশ্যই তার আনুগত্য করে। তাই এক্ষেত্রে অন্তরের উপমাই বেশি উপযুক্ত ও অধিক উচ্চাঙ্গের। সুতরাং অন্তর যখন বিশুদ্ধ হবে তখন নিঃসন্দেহে পুরো শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর অন্তর যখন নষ্ট হবে তখন নিশ্চিতই পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।

বাস্তবতার নিরিখে এ হাদিসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিয়ে কেউ কথা বলতে থাকলে অনেক কথা বলতে পারবে, অনেক পৃষ্ঠা লিখতে পারবে। কিন্তু আমি শুধু হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাগুলোর দিকেই আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

হাদিসটির ফায়েদাসমূহ

এক.

শরিয়্যার বিধিবিধান তিন ভাগে বিভক্ত। সুম্পষ্ট হালাল, সুম্পষ্ট হারাম ও সংশয়পূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম এবং উদাহরণ নিম্নরূপ—

সুম্পষ্ট হালাল। এটা করার কারণে কাউকে তিরস্কার করা হবে না। যেমন, শস্যদানা, ফল-ফলাদি ইত্যাদির মতো হালাল খাবার ভোগ করা। সুতরাং এটা সুম্পষ্ট হালাল।

সুম্পষ্ট হারাম। এটা করার কারণে প্রত্যেককে তিরস্কার করা হবে। যেমন, মদ্যপান করা, মৃত প্রাণী ও শূকর ভক্ষণ করা ইত্যাদি। এটার বিধানও সুম্পষ্ট।

সংশয়পূর্ণ বিষয়। মানুষের মধ্যে এটা মতানৈক্যপূর্ণ। এগুলো নিয়ে তারা মতভেদ করে। কেউ বলে হালাল, আবার কেউ বলে হারাম। কেউ এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে, আবার কেউ এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

উদাহরণস্বরূপ, ধূমপান করা। প্রাথমিক অবস্থায় এটা ছিল সংশয়পূর্ণ বিষয়। কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির কারণে মানুষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে জানার পর এখন নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এটা হারাম। আমাদের নিকট এ ব্যাপারে এখন আর

কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রাথমিক অবস্থায় যদিও তা ছিল সংশয়পূর্ণ ও অস্পষ্ট, কিন্তু পরে তা হারাম হওয়ার বিষয়টা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে।

দুই.

কোনো বিষয় সংশয়পূর্ণ হওয়ার কারণ চারটি। প্রথমত, সে বিষয় সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান। স্বল্প জ্ঞানের কারণে কোনো বিষয় সংশয়পূর্ণ হতে পারে। কারণ, কোনো বিষয় সম্পর্কে যার বিস্তারিত জ্ঞান থাকে সে ওই বিষয় সম্পর্কে যা বুঝে অন্যরা তা বুঝে না। দ্বিতীয়ত, বুঝের কমতি। একজন অনেক কিছুই জানে, কিন্তু বুঝে কম। তাহলে তার কাছে অনেক কিছুই সংশয়পূর্ণ হতে পারে। তৃতীয়ত, বিষয়টা উপলব্ধি করার জন্য পর্যাপ্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে তার অর্থ উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ না করা। চতুর্থ, মন্দ ইচ্ছা করা। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। কিছু মানুষ আছে, যারা ভুল-শুদ্ধের দিকে না তাকিয়ে শুধু চায় নিজের কথাটা জয়ী হোক। যার নিয়ত থাকে এমন, ইলম অন্বেষণ করা তার জন্য হারাম। কারণ, সে চায় ইলমের মাধ্যমে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

তবে সংশয়পূর্ণ বিষয় সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যা সম্পর্কে অনেকেই অনবহিত।’ এ থেকে বুঝা যায়, কিছু মানুষ তা স্পষ্টভাবে জানে। দ্বিতীয়ত, কুরআন-সুন্নাহ যদি সবার কাছে সংশয়পূর্ণ হতো তাহলে কুরআন সুস্পষ্ট কিতাব হিসেবে বিবেচিত হতো না এবং শরিয়ার অনেক কিছুই অস্পষ্ট থাকত; অথচ এটা অসম্ভব ও অবাস্তব একটি ব্যাপার।

তিন.

সংশয়পূর্ণ বিষয় উল্লেখ করার মধ্যে আল্লাহর হিকমত হলো, ইলম অন্বেষণের প্রতি কে আগ্রহী আর কে আগ্রহী নয়, তা প্রকাশ করা।

চার.

শরিয়ার মধ্যে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকবে, যা পৃথিবীর কেউ জানবে না তা হতে পারে না। কারণ, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যা সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত।’ অর্থাৎ সবাই নয়।

পাঁচ.

সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকার প্রতি উৎসাহ দান। কিন্তু দূরে থাকতে হবে সে সময়, যখন সংশয়পূর্ণ হওয়ার ওপর দলিল পাওয়া যাবে। সংশয়পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দলিল না পাওয়া গেলে তা সংশয়পূর্ণ মনে করা অন্তরের কুমন্ত্রণা। তবে যদি সংশয়পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল পাওয়া যায় তাহলে মানুষকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হবে।

তার উদাহরণ, সহিহ বুখারিতে আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, ‘একদল লোক নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, কিছু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, আমরা জানি না তারা এগুলো আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করে কি না। প্রত্যন্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা “বিসমিল্লাহ” বলে খাও। আয়িশা রা. বলেন, তারা ছিল নওমুসলিম।’^[১]

প্রশ্ন : তাহলে কি এমন গোশত খাওয়া থেকে আমরা বিরত থাকব? কারণ, আশঙ্কা আছে, হয়তো আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়নি।

উত্তর : আমরা বিরত থাকব না। কারণ, গোশত ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকার কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাও।’ এটা বলে তাদেরকে এক প্রকার তিরস্কার করা হয়েছে। যেন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অন্যরা কী করে না করে তোমাদের তা দেখার দরকার নেই; বরং নিজেরা কী করো তা দেখা দরকার। তাই আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করো।’

সুতরাং আপনার কাছে কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান নিজের জবেহকৃত পশু নিয়ে এলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, তা কি ইসলামি পদ্ধতিতে জবেহ করা হয়েছে নাকি অন্য পদ্ধতিতে? কারণ, এ প্রশ্নের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি (যা ইসলাম পছন্দ করে না)।^[২]

[১] সহিহুল বুখারি : ২০৫৭, ৫৫০৭

[২] সন্দেহ নেই যে, ইহুদি বা খ্রিষ্টানের জবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল। তবে শর্ত হলো, সে প্রকৃত অর্থেই ইহুদি বা খ্রিষ্টান হতে হবে। বর্তমানে অনেক নামে তো ইহুদি বা খ্রিষ্টান, কিন্তু কথা ও কার্যকলাপে মূলত সে নাস্তিক। মুসলিম নামধারীদের মধ্যেও এমন লোকের সংখ্যা কম নয়, যারা বংশসূত্রে বা নামে তো মুসলিম, কিন্তু কার্যত তারা নাস্তিক। এ ধরনের লোক হলে তার জবেহকৃত পশু খাওয়া কিছুতেই হালাল হবে না। তাই ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক বা মুসলিম হোক, আপন ধর্মের গণ্ডিতে থাকলে তবেই তাদের জবেহ খাওয়া হালাল। কিন্তু আধুনিকতার ছোয়ায় নিজেদের ধর্মীয় চিন্তাচেতনা পরিবর্তন করে নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করলে তাদের বিধানও ভিন্নতা আসবে। তাই এ ব্যাপারটি খুব ভালোভাবে লক্ষ রাখা উচিত। উল্লেখ্য যে,

প্রশ্ন : কারও কাপড়ে একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। সে জানে না তা নাপাক নাকি পবিত্র। তাহলে কি সে এ কাপড় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে?

উত্তর : সে লক্ষ করবে, নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু। যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। সম্ভাবনা যত বেশি গাঢ় হবে ততবেশি বিরত থাকবে। আর নাপাকের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তার প্রতি ভ্রক্ষেপও করবে না। এ কারণেই যখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার সালাতের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, তার অঙ্গু ছুটে গেছে কি না, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনো আওয়াজ কিংবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সালাত ছাড়বে না।^[১]

শরিয়তের একটি মূলনীতি হলো, কোনো বিষয় সন্দেহপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা শক্তিশালী হলে তা থেকে বিরত থাকার বিষয়টিও হবে শক্তিশালী। আর সম্ভাবনা দুর্বল হলে তা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারটিও হবে দুর্বল। আর মোটেও কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তা পরিত্যাগ করা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন, যা নিষিদ্ধ।

হয়.

সংশয়পূর্ণ বিষয়ে পতিত হওয়া মানে হারামে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়া। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল সে হারামে পতিত হওয়ার উপক্রম হলো।’

সাত.

এ হাদিসে মানুষকে শেখানোর জন্য নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম শিক্ষাপদ্ধতি পাওয়া যায়। তিনি বাহ্যিক উপমা ব্যবহার করেছেন, যেন বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআনের পদ্ধতিও তাই। কুরআনের ভাষায় :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে নাস্তিকতার হার সবচেয়ে বেশি। সে তুলনায় মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে অনেক কম। পাশাপাশি এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কারও গভীরে গিয়ে তার নাস্তিকতা তালাশ করার প্রয়োজন নেই। ধর্মের গণ্ডি পার না করে বাহ্যিকভাবে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বা মুসলিম থাকাটাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, কারও স্বীকারোক্তি, কথাবার্তা বা কার্যক্রম থেকে নাস্তিকতা প্রকাশ পেলে তবেই তার ওপর নাস্তিকতার বিধান আরোপ করতে হবে, এর পূর্বে নয়।—সম্পাদক।

[১] সহিহুল বুখারি : ১৩৭, ২০৫৬; সহিহ মুসলিম : ৩৬১, ৩৬২